

অন্ধ রাতের আলাপ সুকান্তি দত্ত

এ ভাবে তাড়া খেয়ে পালিয়ে আর কতদিন—

অসমাপ্ত কথা যেন ঘন তমসায় পথ হারায়। জঙ্গলের দিক থেকে রাতচরা পাখির কান্না, একটানা নয়, থেমে থেমে। পচা দুর্গন্ধময় হাড়-জিরজিরে খাল। কচুরিপানা আর বিচিত্র আবর্জনার ভারে মুমূর্ষু শ্রোত। খালের পাড়ে শ্মশান। চিতা জ্বলছে। ইলেকট্রিক চুল্লি নয়, কাঠের চিতা। উড়ন্ত ছাই। বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ। থমথমে রাত। শ্মশানটি প্রাচীন, শব দাহ কম হয়। মাইল পাঁচ-ছয় দূরে আর-একটি শ্মশান, বয়েসে অপেক্ষাকৃত নবীন, ইলেকট্রিক চুল্লি আছে। এখানকার বেশিরভাগ লোকজন সেখানেই শব দাহ করে।

শ্মশান থেকে একটু দূরে, ঘাসের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কেউ ইটভাটার বা জঙ্গলের দিকে মুখ করে, কেউ শ্মশান বা খালের দিকে মুখ করে, গোল হয়ে বসেছে সাতজনের দলটা। কেউ লুঙ্গি আর গেঞ্জি, কেউ জিনস্ আর টিশার্ট, কেউ পাজামা আর হাওয়াই শার্ট। দুজন সত্তরের খানিক এধার-ওধার, বাকিদের কেউ পঞ্চগশ, চল্লিশ, তিরিশ, কেউ সবে কুড়ি। কেউ খালি পা, কেউ হাওয়াই চটি, কেউ বুট জুতো। কেউ রোগা, কেউ মোটা। কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা। স্কুলমাস্টার ছিল কেউ, কেউ বুড়ি বানায়, কেউ চাষি, নাপিত, ফল-ব্যাবসায়ী, মন্দিরের পুরোহিত, কলেজ-ছাত্র।

মাঝে মাঝে কথা। উগরে দেওয়া ঘেন্না, রাগ, দুঃখ, হাহুতাশ। কথার পিঠে কথা। নীরবতা, আবার কথা।

—অনেক— অনেক লাশ পড়বে।

—হ্যাঁ, সবে শুরু, শুনলাম খালের ওপারে বাইরে থেকে লোক ঢুকেছে।

—তবে তো সহজে থামবে না, অনেক খাল্লাস হবে, রক্তে লাল হয়ে যাবে খালের জল।

—বদলা চাই, বদলা বদলা!

—বদলাই চলছে তো, কখনো ওরা কখনো আমরা!

অন্ধকারে কোনো চোখ জ্বলজ্বল করে, আগুনের গোলা, এখুনি সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। কোনো চোখ অবসাদ মেখে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে অন্ধকারেই মিশে যেতে চায়। কোনো চোখ ঘাড় তুলে আকাশে, কী যেন খোঁজে, মেঘ? তারা? চাঁদ? শূন্য দৃষ্টিতে কেমন এক হাহাকার। কোনো চোখ ভয়ংকর হিংস্রতায় এখনই কাটারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, অন্ধকার চিরে ফালাফালা করে দেবে।

—আমরা কি বাল সারারাত এখানেই বসে থাকব?

—উপায় কি? জবাই হয়ে যাওয়ার থেকে সেই ভালো।

—দেবী রক্ত চান, রক্ত দিতেই হবে।

—দেবী? কোন দেবী? ভোটের দেবী?

—দেবী, মা কালী। এই শ্মশানের কালীমা খুব জাগ্রত।

—মা, মা, রক্ষা করো মা।

—মা কাউকে রক্ষা করবে না রে— পাপে ভরে গেছে— সবাই পাপী, শাস্তি পেতেই হবে।

—ভুল, বড়ো ভুল হে—

—ওদিকে মণিপুরে—

—জানি, আগুন লেগেছে, জ্বলছে, পুড়ছে।

—রক্ত, আগুন, আগুন কি নিভবে না?

—কত বছর ধরে কত আগুন কত রক্ত দেখলাম—

আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমাট, অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসে। জমে থাকা রাগদুঃখগুলো বাদুড়ের মতো উড়ে বেড়ায়। ঝুলে থাকে নুয়ে আসা শীর্ণ বটের ডালে, ঝোপঝাড়ো। দূরে শেয়ালের ডাক। শ্মশানের পশ্চিম দিকে খাল, পূর্বদিকে রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গল। উত্তরে অনেকটা এগিয়ে ইটভাটা। দক্ষিণে রাস্তা খানিক এগিয়ে খালের পাশে দিয়ে বাঁক নিয়েছে জঙ্গলের দিকে। বট, অশ্বথ, শ্যাওড়া, বাঁশগাছের সারি। নানা লতানে গাছ, হোগলা বন। খুব বড়ো ঘন জঙ্গল নয়। সাপ আর শেয়াল ছাড়া জন্তু-জানোয়ার তেমন কিছু নেই।

শ্মশানে জ্বলন্ত চিতার পাশে বাঁশের লম্বা লাঠি হাতে ডোম, হাফপ্যান্ট, খালি গা। লম্বা, তাগড়া শরীর। ঘুরছে, দাঁড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে মুখে অদ্ভুত শব্দ। শ্মশানের ভেতরে মা কালীর মন্দির, চার-পাঁচজন শ্মশানযাত্রী নিশ্চুপ বসা মন্দির চাতালে।

বাইরে একটু দূরে গোল হয়ে বসা সাতজনের দল কখনও চুপ, কখনও অন্ধকারে কথা ছোঁড়াছুঁড়ি। কেউ পেছনে হাতের ভর রেখে ঠ্যাঙ মেলেছে সামনে, কেউ দু-হাটু তুলে দুহাতে বেড় দিয়ে বসেছে, কেউ হাঁটু ভাঁজ করে আসন পিঁড়ি।

—আমাদের এখানে সেই চৌষটি সালে, দাঙ্গার সে সব ভয়ংকর দিন—

—হুঁ, শুনেছি সে সব।

—শুনেছিস, তোরা দেখিসনি সে সব দিন, চেনা মানুষ, প্রতিবেশী, কেমন অচেনা হয়ে ওঠে।

বটগাছের তলায় বসা ঘেয়ো কুকুরটা হঠাৎ আকাশের দিকে ঘোলা চোখ তুলে কাঁদে। খালের পাড় ঘেঁষে পোকামাকড়েরা গোঙায়। অন্ধকার আরও জমাট।

—তারপর দেখলাম কত—কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, ইন্দিরা গান্ধি খুন হওয়ার পর দিল্লি, বাবরি ধ্বংসের পর দেশজুড়ে—

—হ্যাঁ, মনে আছে।

সাতজনের দল থেকে কমবয়সি একজন উঠে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খালের আরও কাছে এগোয়, অন্ধকার ফুঁড়ে ওপারের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করে। পকেট থেকে একটা ছোটো শিশি, দেশি মদ, গলায় ঢালে একটু।

—তারপর দেখলাম গুজরাট, এখন আবার মণিপুর—

—আর এখানে? বাংলায় কিছু দেখলে না?

কাছেই কোথাও বিকট শব্দ। থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে মাটি। বোমা। তারপর থমথমে রাত যেন নিঃশব্দে তর্জনী তুলে শাসায়। দ্রুত বাতাস কাঁপে। কমবয়সি ছেলেটি খালের কাছ থেকে ছুটে আসে হজনের বৃন্তে।

—ওই, ওই, শোনো, ওরা আরও মাল টেস্টিং করছে। এখানে থাকা কি ঠিক হবে?

—না, না, এ দিকে জঙ্গলের ভেতরে শব্দ, এরা আমাদের লোক।

চব্বিশ ঘন্টা শ্মশানে থাকা, ময়লামাখা, চুলদাড়িতে জট পাকানো পাগলটা ন্যাংটো হয়ে কোমরে জড়ানো কাপড়ের টুকরো মাথার ওপরে ঘুরিয়ে ‘পালাও’ ‘পালাও’ বলে ছুটে যায় ইটভাটার দিকে। খালের পাড়ের গর্ত থেকে সরসরিয়ে বেরিয়ে আসে কালসাপ। ফণা তোলে। জমাট অন্ধকারে ছাই ওড়ে। ঘেয়ো কুকুরটা ফের সুর চড়িয়ে কাঁদে।

—বাংলায়? দেখব না কেন? চৌষটির দাঙ্গার কথা দিয়েই তো শুরু করলাম, সত্তর

একাত্তরে রাজনীতির খুনোখুনি— তারপরেও মাঝে মাঝেই এদল বনাম ওদল— আর এখন তো দল ধম্ম সব একাকার হয়ে ওরা বনাম আমরা—

—ঠিক বলেছ জ্যাঠা। আমরা বুনো শুয়োরের মতো লড়ে চলেছি নিজেদের মধ্যে, এ ওর রক্ত মাখছি। কখনও দলের নামে, ধর্মের নামে—

—আমরা? আর ওরা?

—ওরা আমরা সবই এক, নুন আনতে পান্তা ফুরায়, ধোন ঢাকতে পোঁদ বেরোয়—

—এ সব আঁতলামি, বালের কথা ছাড়ো, জোর তার মুলুক তার, এই হল সোজা কথা, আসল কথা।

একটু দূরে কে যেন হা হা হাসে, অটুহাসি, পাগলটা? মড়ার খুলি হাতে ছুটে আসে, ছুঁড়ে দেয় খালের দিকে। একটু দূরে পিলপিল করে বেরিয়ে আসে বিষ-পিঁপড়েরা, নরম মাংস খোঁজে। আলকাতরা-অন্ধকার সহ্যহীন ক্রোধে আরও গাঢ় ঘন হয়ে চেপে বসে।

—মহাভারতের কথা মনে নেই? ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি, দুঃশাসনেরা যুগে যুগে—

—মহাভারতের কথাই যদি বলো, তবে শীক্শ, ভীম, অর্জুন, এরাও তো ছিল, নাকি এ এক অন্য মহাভারত?

—আর মহাভারত— মহল্লার জোয়ান ছেলেগুলো বেশিরভাগই বাইরে বাইরে—

—শালা! খবরের কাগজের বাবুরা আবার গালভরা নাম দিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিক।

—ও দিকে পোধানের বাড়ি গাড়ি সব বাড়ছে—

—দূর, দূর, ঘেন্না ধরে গেল! এ দল সে দল কত দল ঘুরলাম!

—অতশত জানি না, আমি বদলা চাই, বদলা। খুন কা বদলা খুন। শালাদের মেরে তাড়াতে হবে, বেইমান সব।

—হ্যাঁ, মেরে তাড়াও বেইমানদের।

—কাকে মেরে তাড়াবে? নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?

—চোপ শালা! এই জন্যেই ওদের এত বাড়। তোমার প্রেমের কথা ওরা শুনছে?

বহু দূর থেকে আসা নষ্ট হাওয়া ফিসফিস করে বিষ ছড়ায়। শরীরে ঘেন্নার কফ জড়িয়ে রাত গড়ায় নরকের খাদে। বিষের আঁশটে গন্ধের সঙ্গে বাতাসে লতপত করে খালপচা গন্ধ। গর্ত থেকে বেরোনো কালসাপটা দলটির কাছাকাছি এসে ঘাসের ভেতর নিঃশব্দে ঘাপটি মেরে থাকে। বটগাছ থেকে কয়েকটা বাদুড় উড়ে যায় জঙ্গলের দিকে। মেঘের পরে মেঘ জমতে জমতে গুড়গুড় শব্দ তোলে।

—বাদল কাকার কী হল? কোনো কথা নেই যে, একেবারে চুপ।

—শুনছি, ভাবছি।

—কী ভাবছ?

—কোথায় ভুল হল? জীবনভর লড়াই তো কম করলাম না, তবু—

—সবাই কপাল। সবই তার ইচ্ছে।

—কপাল মানিনি, লাঠি হাতে পথে নেমেছি, জোট বেঁধেছি, রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিয়েছি।

—তো?

—হকের জমি, বাগান, জান মান, সব রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছি।

—তো? কী হল তাতে? কপাল, কপাল।

—রক্ত তখনও ঝরেছে, কিন্তু তা ছিল হকের লড়াই—

মেঘেদের চাপা সন্ত্রাস, আকাশ-চেরা বিদ্যুৎরেখা, দূরে কোথাও বাজ কড়কড়কড়াৎ। নষ্ট হাওয়া থম মেরে থাকে। শীর্ণ বটের কোটর থেকে কটকট করে কী যেন ডেকে ওঠে।

—কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে, অনেক ভুল—

—হ্যাঁ কাকা, ভুল পথ বেয়ে গড়িয়ে গেছি খাদে, আর এখন সেই ভুলের মাশুল দিতে

দিতে ‘বল হরি, হরি বল’, শাশানে শব নিয়ে ঢোকে কয়েকজন। রাতচরা কী এক পাখি ফের কেঁদে ওঠে। সবাই চুপ। ঘাসের ভেতর কালসাপের হিসহিস। ‘বল হরি হরি বল’। শেয়ালের সমবেত হুঙ্কাহুয়া। ফস করে দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরায় একজন।

—মায়ের বাহনরা সব ডাকছে। মা, মা গো, মা কালী, রক্ষা করো মা।

—শাশানে জাগিছে শ্যামা, অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে—

—দেখো, এবার এলোচুলে শেয়ালের পিঠে মা বেরিয়ে পড়বে। জয় মা।

—ওই জঙ্গলে বহুকাল আগে এক সময় ডাকাত-কালীর মন্দির ছিল।

—হ্যাঁ, গল্প শুনেছি দাদুর কাছে।

—ডাকাতরা পূজো দিয়ে কপালে লাল তিলক কেটে ডাকতি করতে বেরোত।

—নরবলি হত?

হত বই কি, এখন একভাবে হচ্ছে, তখন আর-একভাবে। শুনেছি ডাকাতরা ইংরেজ আমলে এক অত্যাচারী জমিদারকেও বলি দিয়েছিল। তারপর জঙ্গলে পুলিশ মিলিটারি ঢুকে সে এক কাণ্ড!

পোড়া পোড়া গন্ধ। ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বটগাছ তলা থেকে উঠে হঠাৎ ঘেয়ো কুকুরটা শাশানের দিকে দৌড়ায়। পোড়া গন্ধের সঙ্গে মেশে খালপচা গন্ধ। অন্ধকার গলে গলে পড়ে আবার অন্ধকারেই মিশে যাচ্ছে।

—শালা কী অন্ধকার! ও বাদল কাকা? ঝিমোচ্ছ নাকি?

—না, দেখছি।

—এত ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছ? আমি তো তোমার মুখটাও ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না।

—এ দেখা সে দেখা নয় রে।

—তাই? তা কী দেখছ? শাশান কালী?

—না, একটা দানব।

—দানব? বলো কী!

—হ্যাঁ। দানব, ভয়ংকর এক দানব।

—তবেই বোঝো, আসল কথা হল, জোর, জোর, জোর যার—

—বহু যুগ ধরে একটা দানব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—জোর, জোর, ক্ষমতা—

—দানবটা মরে না, পিছু হটে, কোণঠাসা হয়, আবার সুযোগ মতো দাঁত নখ বের করে।

—তা বটে!!

—দানবটা কোনো কোনো সময় আমজনতার হাতে বেধড়ক মার খেয়ে নেতিয়ে পড়ে।

তখন তাকে সাময়িক লুকিয়ে ফেলে সেবায়ত্ত্ব করে আবার সুস্থ করে তোলা হয়।

—গল্প নাকি?

—গল্প ভাবলে গল্প, সত্যি ভাবলে সত্যি।

—বেশ। তারপর?

শাশান থেকে কান্না ভেসে আসে। সে-কান্নার সুরে কেমন এক অমঙ্গলের আভাস, যেন সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। সবাই চুপ। ফের শেয়াল ডাকে। কাছেই বিকট শব্দে, জঙ্গলের দিকে, বোমা ফাটে।

—অনেক খুনজখম হবে। কেউ বাঁচবে না। কাল কী হবে ভাবো, এভাবে পালিয়ে পালিয়ে কতদিন—

—একটু সবুর করতে হবে। খবর পাঠানো হয়েছে।

—খবর? কোথায়?

—একটা বড়ো দল আসছে। অনেক গোলা বারুদ বন্দুক নিয়েই আসবে। জঙ্গলে ক্যাম্প করে থাকবে।

একজন উঠে বেশ কয়েক পা এগিয়ে খালের দিকে যায়, লুঙ্গি তুলে ছ্যারছ্যার করে ছেড়ে দেয়। একজন মেলে দেওয়া ঠ্যাঙ দুটো গুটিয়ে নিয়ে জামার পকেটে থেকে বিড়ি বের করে।

—মেয়ে বউকে কতদিন দেখি না।

—সবারই এক অবস্থা। এক এক সময় মনে হয়—

—কী?

—একটা হেস্টনেস্ট হয়ে যাক, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো, ইনস্টলমেন্টে খুনোখুনি মারামারি আর ভালো লাগে না।

—হ্যাঁ, হয় ওরা থাকবে, নয়তো আমরা। ভাবছি বড়ো দলটা আসলে, জঙ্গলে ট্রেনিং নিতে চলে যাব।

—মেয়ের ভালো সম্বন্ধ এসেছিল, ছেলের মাছের আড়ত আছে, বিয়ের কথা প্রায় ঠিকঠাক। হঠাৎ মারামারি শুরু— সব ভেসে গেল।

—ভোট, ভোট, সব ভোটের হিসেব। যত খুনোখুনি হবে আমরা একদিকে, ওরা আর-একদিকে, অন্য কথা ভাবার কোনো উপায়ই থাকবে না।

—মজা হচ্ছে কী জানো?

—কী?

—এত বুঝেও কিছু করার নেই। এমন ফাঁদ পেতেছে ধরা দিতেই হবে।

—ওসব বালের কথা রাখো, আমরা বুঝে কী করব? ওরা কি বুঝছে? পাল্টা মার না-দিতে পারলে আর গ্রামে থাকা যাবে না।

—ঘোর কলি হে, ঘোর কলি। কেউ বাঁচবে না।

চলতেই থাকে কথার পিঠে কথা, সে-কথার কত রকম সুর, কত রকম রং। রাগ দুঃখ হতাশার কত বিচিত্র আলাপ। অন্ধকারে আরও অন্ধকার ছুঁড়ে দিয়ে বাতাসের তরঙ্গ বেয়ে কথাগুলো ছড়িয়ে যায় দূরে কাছে। উড়ে যায় জঙ্গলের দিকে, ডাকাত-কালীর পোড়ো মন্দিরের দিকে। শেয়াল ডাকে।

—রক্ত, নররক্ত, মা রক্ত চাইছেন। পাপে ভরে গেছে পৃথিবী।

—পাপপুণ্য কী? বুঝি না বাপু। আসল পাপীদের তো রক্ত ঝরে না। যত রক্ত ঝরে আমাদের।

—গত বছর একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছিলাম, টাঙ্গির কোপটা ঘাড় ছুঁয়ে—

—তুমি বেঁচে গেলেও আমার কাকার মুণ্ডটা— ধড় থেকে আলাদা হয়েও চোখদুটো কী যেন বলছিল।

—চুপ করো, চুপ। জঙ্গলের ও দিক থেকে কারা যেন আসছে।

সবাই চুপ। হাতের লাঠি শক্ত করে ধরে একজন, আর-একজন রিভলবার বের করে। কতগুলি ছায়ামূর্তি, মশাল হাতে। রাস্তায় নামে না, জঙ্গলের গা বেয়ে ইটভাটার দিকে এগিয়ে যায়। শ্মশানের পাগলটা রাস্তায় ‘মার’ ‘মার’ বলে ছুটতে থাকে। মশালের আলো ক্ষীণ হয়ে আসে, ছায়ামূর্তিরা একটু একটু করে অন্ধকারে মিশে যায়।

—ভয়ের কিছু নেই, এদিকে সব আমাদের লোক। জঙ্গল, ইটভাটা ওদের দখলে নেই।

—জানি না বাপু, কে যে কখন আমরা থেকে ওরা হয়ে যায়!

—তা ঠিক, কাউকেই আর বিশ্বাস করা যায় না। সব কিছুর থেকে বড়ো হল টাকা, মাল মাল—

—কোনো কোনো সময় তার থেকেও বড়ো জানের মায়া।

—বাদল কাকা, সেই যে বলছিলেন— দানবের কথা—

—হ্যাঁ, কাকা, তারপর সেই দানবের কী হল? দানবটা মরে না, আমজনতার ধোলাই খেয়ে নেতিয়ে যায়, তাকে আবার যত্নআত্তি করে সুস্থ করে তোলা হয়, তারপর?

—তারপর? কী আর হবে? সুস্থ হয়ে আবার শুরু করে তার খেল। আসলে দানবটা তো পোষা।

—কী যে বলো, বুঝি না। কার পোষা? কারা সুস্থ করে তুলল?

—কিছুই বোঝ না? ন্যাকা না বোকা? ওই দানবটার কারসাজিতেই তো মারামারি করে মরছি আমরা।

‘বল হরি, হরি বল’, আবার শ্মশানে শব নিয়ে ঢোকে একটি দল। ঘেয়ো কুকুরটা দূরে বসে আবার বিচিত্র সুরে কাঁদতে থাকে। কাছেই সাপের মুখে পড়া ব্যাঙের গোঙানি।

—সাবধান, সাপ বেরিয়েছে—

—আর সাপ, আমাদের কামড়ালে ওরই মরণ হবে।

—আচ্ছা কাকা, এই যে ফাঁদে পড়েছি আমরা— বেরুনোর কি কোনো উপায় নেই? মুক্তি নাই আমাদের?

আবার সবাই চুপ। বহু সেকেন্ড মিনিট ঝরে যায়। রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সব কথা যেন শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে আর কোনো কথা নেই। আকাশে মৃদু মেঘগর্জন। অন্ধকারে পাক খায় বহু যুগের দীর্ঘশ্বাস। খালে নামছে শ্মশানযাত্রীদের কয়েকজন। কে যেন চিৎকার করে, ‘ব্যোম ভোলে’ ‘ব্যোম ভোলে’। গাঁজার গন্ধ।

—মুক্তি? আপাতত দানবটাকে হার মানাতে পারলে হয়তো— কিন্তু সে বড়ো কঠিন কাজ।

—আমরা যেভাবে বেঁচেবর্তে আছি, এর থেকেও কঠিন?

দলের সবথেকে প্রবীণ মানুষটি অনেকক্ষণ ধরে মাথা নীচু করে হাঁটুর ওপর হাতদুটি এলিয়ে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ নড়েচড়ে ওঠে। লুঙ্গির খুঁটে চোখমুখ মুছে নিয়ে বলে, আসলে দানবটা—

—থামলে কেন জ্যাঠা, বলো।

—দানবটা শুধু বাইরে নেই রে, আমাদের মনের ভেতরেও ঘাপটি মেরে বসে আছে।

পোড়া পোড়া গন্ধ। ছাই উড়িয়ে পাচা গন্ধের বাতাস। গন্ধ ছড়ায় গলিত নীল শবের মতো রাত। আবার বোমার বিকট শব্দে ছিন্নভিন্ন নীরবতা। একটু পরেই বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা দল শ্মশানের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।